আত্মসম্মানবোধ ও আমাদের প্রত্যাশা

'আত্মসম্মানবোধ' আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। সাধারণ অর্থে আত্মসম্মান বলতে আমরা বুঝি নিজেকে সম্মান করা। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর'। আসলেই, যথাযথভাবে মানুষের দেহ ও মনের নিয়ন্ত্রণের মোক্ষম সূত্র হচ্ছে নিজেকে জানা। আমরা শুধু অন্যকে জানার চেষ্টা করি। প্রাত্যহিক জীবনে অন্যের সমালোচনা ও নিন্দা, ঈর্ষা, আত্মকেন্দ্রিকতাসহ অন্যান্য নেতিবাচক চর্চার সূত্রপাত হয় নিজেকে না জানা থেকেই।

যাই হোক, মনোবিজ্ঞানে আত্মসম্মানবোধের ধারণাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - 'আত্মসম্মানবোধ এক ধরনের ইতিবাচক ব্যক্তিক অনুভূতি, যা নিজেকে সম্মান করে এবং নিজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে পরিমাপ করে।' আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক মানুষ সবলতা ও দুর্বলতা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের সংমিশ্রণে গড়া। এ দুয়ের পরিমিতি ও পরিমাপ সম্পর্কে সচেতনতা তার ব্যক্তিসত্তার সাথে একীভূত। যখন ব্যক্তি নিজেকে সম্মান করবে তখন তার মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হবে।

আত্মসম্মানবোধের ধারণাটি শৈশব থেকেই বিকশিত হতে থাকে এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। শৈশবে যখন কারো অনুভূতিকে সম্মান জানানো হয়, চিন্তাকে মূল্যায়ন করা হয়, সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তখন ওই শিশুর আত্মসম্মানবোধ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন শৈশবে কারো অনুভূতিকে পদদলিত করা হয়, চিন্তাগুলোকে অবজ্ঞা করা হয়, তাকে ছোট করা হয়, সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়, তার সক্ষমতার নেতিবাচক সমালোচনা করা হয় (যেমন, 'তুমি জীবনে কিছুই করতে পারবে না', 'তোমার এ ধরনের বাজে চিন্তার কোন মানে হয় না' ইত্যাদি) তখন শিশুর আত্মধারণা নিম্ন স্তরে নেমে আসে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশও দুর্বল হতে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের জীবনঘনিষ্ঠ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেগুলো অনেকাংশে ব্যক্তির সফলতা ও ব্যর্থতা কিংবা এ ধরনের অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়ার মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করবে তার আত্মসম্মানবোধ দুর্বলভাবে নাকি সবলভাবে বিকশিত হবে।

যে ব্যক্তির শক্তিশালী আত্মসম্মানবোধ রয়েছে তিনি অন্যান্য ব্যক্তির জন্য কোনও ধরনের ক্ষতি বা হুমকিস্বরূপ না হয়ে তাদের সাথে স্বাস্থ্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবেন, যা ঐ ব্যক্তিকে সফল হিসাবে ভাবতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে একজন শক্তিশালী আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস, গতিশীলতা, অন্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, লক্ষ্য ও সৃষ্টিশীলতা অর্জনের বাসনা, সন্তুষ্টি এবং নিজেকে বদলে নেয়ার মতো মুক্ত মানসিকতা থাকবে। আর অন্যদিকে, দুর্বল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিম্ন আত্মধারণা এবং নিম্ন আত্মভাবমূর্তি তৈরি হয়। এসব তৈরি হয় ব্যক্তির ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং যে বিচ্যুত পথে ব্যক্তি নিজেকে সফল ভাবতে চায় তার মধ্য থেকে। এ ধরনের ব্যক্তি জটিল প্রকৃতির, আত্মকেন্দ্রীক, নিন্দুক ও পরচর্চাকারী এবং আত্মপ্রত্যয়হীন, অবিশ্বাসী হয়। মাঝে মাঝে দুর্বল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদের পরমোৎকৃষ্ট ও যথার্থ সম্মানবোধসম্পন্নরূপে উপস্থাপন করে। এটা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও অবাস্তব বিবৃতি ও কথাবার্তার আস্ফালন দেখা যায়।

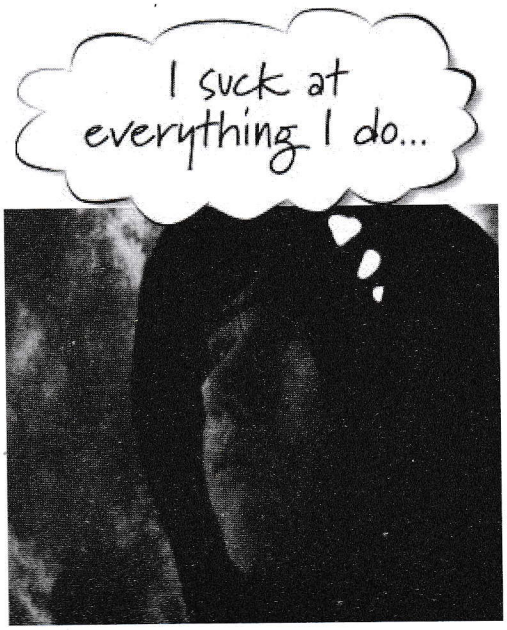

মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আত্মসম্মানবোধের ধারণার সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জড়িত:

আত্মভাবমূর্তি
↓
আত্মধারণা
↓
আত্মমূল্যায়ন
↓
আত্মবিশ্বাস
↓
আত্মসক্ষমতা
↓
আত্মস্বীকৃতি
↓
আত্মশ্রদ্ধা
↓
আত্মগুরুত্ব
↓
আত্মসম্মান

উদাহরণস্বরূপ, 'আমি একজন ছাত্র' (পেশাগত পরিচিতি), 'আমার বয়স পঁচিশ' (বয়স সম্পর্কিত), 'আমি লম্বা' (চেহারা সম্পর্কিত), 'আমি ফুটবল পছন্দ করি' (পছন্দ ও অপছন্দ), 'আমি রাজনীতি পছন্দ করি না', 'আমার রসবোধ রয়েছে' (মনস্তাত্ত্বিক গুণ)।

তবে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসক্ষমতা হচ্ছে এমন বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে ব্যক্তির সবল দিক জানা যায়, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সফল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: 'আমি কোন কিছু করার জন্য মনস্থির করলে তা করতে পারি' (সাধারণ দক্ষতা)। সুতরাং, নিজের সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার না হলে আমরা নিজেদের সম্মান করব না। এক্ষেত্রে অন্যদের সম্মান করার প্রয়াস কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম তা ভেবে দেখার দাবি রাখে। এখানে বলে রাখা দরকার যে আত্মভাবমূর্তি, আত্মধারণা ও আত্মমূল্যায়ন - এসব একজন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সার্বিক প্রতিফলন, যার দ্বারা সব সময় ব্যক্তির নিজস্বতা সম্পর্কে কোন ধরনের বাছ-বিচার বা মূল্যায়ন প্রকাশিত হয় না, তবে তা ব্যক্তির বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। যেমন, 'আমি সাতক্ষীরা থেকে এসেছি' (আঞ্চলিক পরিচিতি), 'আমি বাঙালি' (সাংস্কৃতিক পরিচিতি)।

আত্মস্বীকৃতি, আত্মশ্রদ্ধা, আত্মগুরুত্ব এবং আত্মসম্মান - এ বিষয়গুলো কিছুটা ভিন্ন। এগুলো সাধারণভাবে ভালো বা মন্দের বিশেষণে বিশেষিত নয়। আমাদের বিশ্বাসের ওপরেও এ ধারণাগুলো সরলভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়গুলো নিজের সম্পর্কে আমাদের সার্বিক মতামত এবং মানুষ হিসাবে আমরা নিজেকে কতটা মূল্য দিয়ে থাকি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। যেমন, 'আমি ভালো', 'আমি খারাপ', 'আমি যোগ্য', আমি অপদার্থ' ইত্যাদি। যখন আমরা নিজেকে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করি তখন থেকেই নিম্ন আত্মসম্মানবোধ তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে নিজেকে অসম্মান, নিজের অর্জন ও সক্ষমতা সম্পর্কে নিম্ন ধারণা এবং অন্যকে ছোট করা ও নানাবিধ বিচ্যুতিমূলক আচরণের জন্ম দেয়। আগেই বলা হয়েছে, নিম্ন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা জটিল প্রকৃতির, নিন্দুক, পরচর্চাকারী ও আত্মপ্রত্যয়হীন হয়। তারা সবকিছু সহজভাবে নিতে পারে না। তবে, তাদের মধ্যে বিষণ্নতাও পরিলক্ষিত হতে পারে।

নিম্ন আত্মসম্মানবোধের আচরণগত প্রভাব

বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে

নিম্ন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা ধারাবাহিকভাবে নিম্ন মানের কাজ করে থাকে। তারা কোন চ্যালেঞ্জ নেয় না। সম্ভবতঃ, তারা চায় ১০০% নিখুঁত হতে। যার মূলে রয়েছে ব্যর্থতার পূর্বাভাস। নিম্ন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের অর্জনগুলোকে ইতিবাচকভাবে স্বীকৃতি দিতে পারে না। তারা তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

নিম্ন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমালোচনাপ্রবণ ও সংবেদনশীল। তারা অন্যকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে, কিন্তু নগ্ন চাটুকারিতা অথবা সামাজিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। তারা সামাজিক সম্পর্ক নির্বাহের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক বা চালিকা শক্তি মনে করে অথবা কৌশলে অন্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে বিচ্যুতভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, এর জন্য তাদের কী মূল্য দিতে হয় তারা তা জানে না।

অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে

নিম্ন আত্মসম্মানবোধের মানুষরা অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি বা পুরস্কার না পাওয়ার ভয়ে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও এড়িয়ে যায়।

আত্মপরিচর্যার ক্ষেত্রে

নিম্ন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রতি যত্নবান থাকে না। তারা সময়মতো চিকিৎসকের কাছে যায় না, চুল কাটে না, ভালো জামাকাপড় পড়ে না। বরং, তারা বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক কাজ (যেমন, ধূমপান, মদ্যপান, অন্যকে ঠকানো ইত্যাদি) নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা সহজেই রেগে যায় এবং নিজেদের দুর্বল জায়গাগুলোকে খোলা মনে মেনে নিয়ে সংশোধনের চেষ্টাও খুব কমই করে।

যখন আমরা নিজেকে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করি তখন থেকেই নিম্ন আত্মসম্মানবোধ তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে নিজেকে অসম্মান, নিজের অর্জন ও সক্ষমতা সম্পর্কে নিম্ন ধারণা এবং অন্যকে ছোট করা ও নানাবিধ বিচ্যুতিমূলক আচরণের জন্ম দেয়।

নিম্ন আত্মসম্মানবোধের মানচিত্র

অতীত অভিজ্ঞতা

শৈশব-কৈশোরের বিশেষ ঘটনা, সম্পর্ক,
বেড়ে ওঠার সূচকসমূহ, যা ব্যক্তিসত্তার ধারণা সৃষ্টি করে।
যেমন, প্রত্যাখ্যান, অবহেলা, নিপীড়ন, শাস্তি ও
নিরন্তর সমালোচনা।

↓

ব্যক্তির আত্মমূল্যায়ন

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরাসরি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,
নিজের ধরন অনুসারে,
যেমন, আমি খারাপ, আমি মূল্যহীন, আমি বোকা,
আমি ভালো মানুষ নই ইত্যাদি।

↓

নীতিসিদ্ধ অনুমান

কৌশল, নিয়ম ইত্যাদির মাধ্যমে মানিয়ে নেয়া।
যেমন, আমাকে সব সময় অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে,
না হলে আমি প্রত্যাখ্যাত হব।
আমাকে সব সময় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানের ব্যক্তি হিসাবে
কাজ করতে হবে, নইলে আমি কিছুই
অর্জন করতে পারব না।

↓

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিসমূহ

যেসব পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ত্রুটিপূর্ণ
নিয়মগুলো ভেঙে যায় বা কাজ করে না।
প্রত্যাখ্যাত হওয়া, ব্যর্থতার ভয় তৈরি হওয়া
অথবা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা।

↓

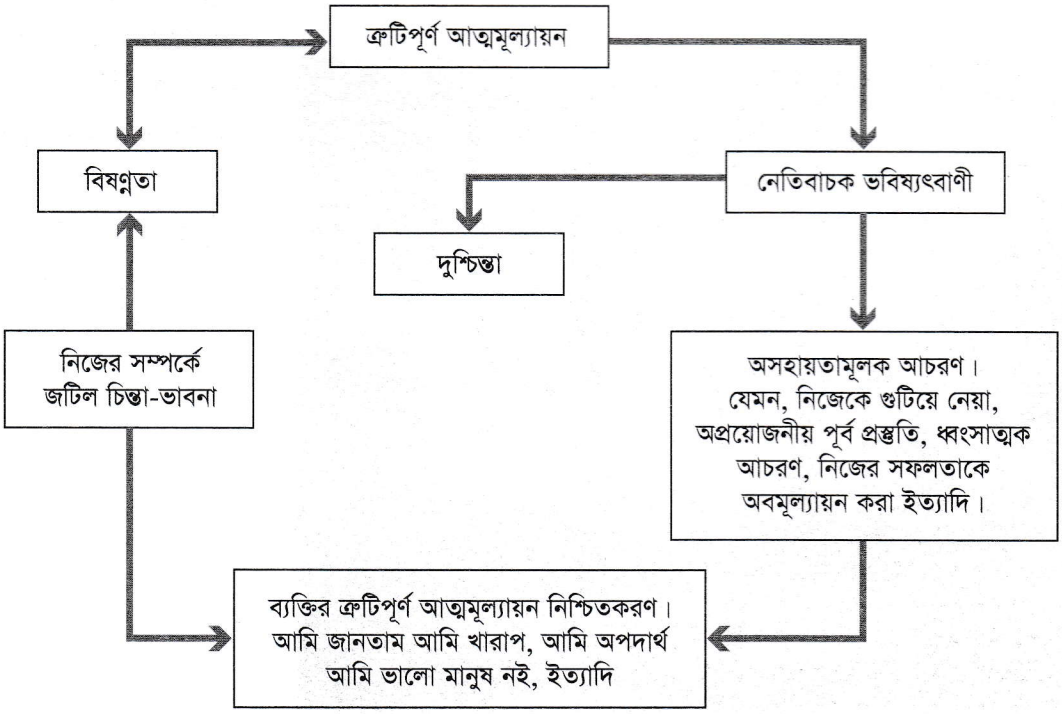

নিম্ন আত্মধারণার অতীত কারণসমূহ (শৈশবকালীন)

- ধারাবাহিক শাস্তি প্রয়োগ।
- পিতা-মাতার মানসম্মত পরিচর্যার অভাব।
- সহপাঠী বা বন্ধুবান্ধবের মানসম্মত ভূমিকার অভাব।
- পিতা-মাতার ব্যক্তিগত চাপ, অশান্তি ও অসুখী জীবনের প্রভাব।
- কুসংস্কারাচ্ছন্ন পারিবারিক পরিবেশ।
- পারিবারিক পরিবেশে প্রশংসা, স্নেহ, উষ্ণ স্বীকৃতি ও সমর্থনের অভাব।
- বিদ্যালয় ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বৈষম্য।

নিম্ন আত্মসম্মানবোধের পরবর্তী কারণসমূহ

কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ভীতি, কর্মে অসন্তুষ্টি, জবরদস্তিমূলক কর্মঘণ্টা, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, নিপীড়নমূলক ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক, অহেতুক ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, দারিদ্র ও চরম আর্থিক সঙ্কট, সঙ্গদোষ, ত্রুটিপূর্ণ জীবনধারা ও চালচলন, কষ্টকর বা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা যা মানসিক ক্ষত সৃষ্টি করে এমন। এক্ষেত্রে নিম্ন আত্মসম্মানবোধের পূর্ববর্তী কারণগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া শৈশবেই সূচিত হয়। তাই, যেসব শিশু শৈশবে ক্রমাগতভাবে শাস্তি পায়, উত্যক্ত হয় এবং খারাপভাবে লালিত হয় তাদের আত্মধারণার ওপর এগুলো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা পরবর্তীতে ভীতিকর অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। যেসব পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের পরিমিত অভিভাবকত্বের পরিসীমায় লালন করতে পারেন নি, শাস্তি না দিলেও শিশু সন্তানকে এমন তির্যকভাবে সমালোচনা করেছেন যা শস্তিকেও হার মানায়, কিংবা শিশুর সক্ষমতা ও সফলতার চেয়ে দুর্বলতা ও ভুলগুলোকে বার বার সামনে আনার চেষ্টা করেছেন, এমনকি এমনভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভরে অবজ্ঞা করেছেন যে তা শিশুর নিম্ন আত্মধারণা ও নিম্ন আত্মসম্মানবোধকে শক্তিশালী করেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠী বন্ধুর কাছ থেকে যখন শিশু কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন তা তার মনে গেঁথে যায়। খেলার সময় একজন সহপাঠীকে প্রত্যাখ্যান করা, কথা না বলা, কারো চলাফেরা, উচ্চারণ, পোশাক, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করা শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা, একাকীত্ব, বিষণ্ণতা ও নিম্ন আত্মধারণার সৃষ্টি করে। আমরা একজন শিশু কিংবা একজন মানুষকে খুব অল্প জেনে বা দু-একটা উদাহরণ থেকেই সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করে ফেলি - তার বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সক্ষমতা বা অক্ষমতা সম্পর্কে - যা ঐ মানুষের গায়ে একটি লেবেল বা ছাপ লাগিয়ে দেয়।

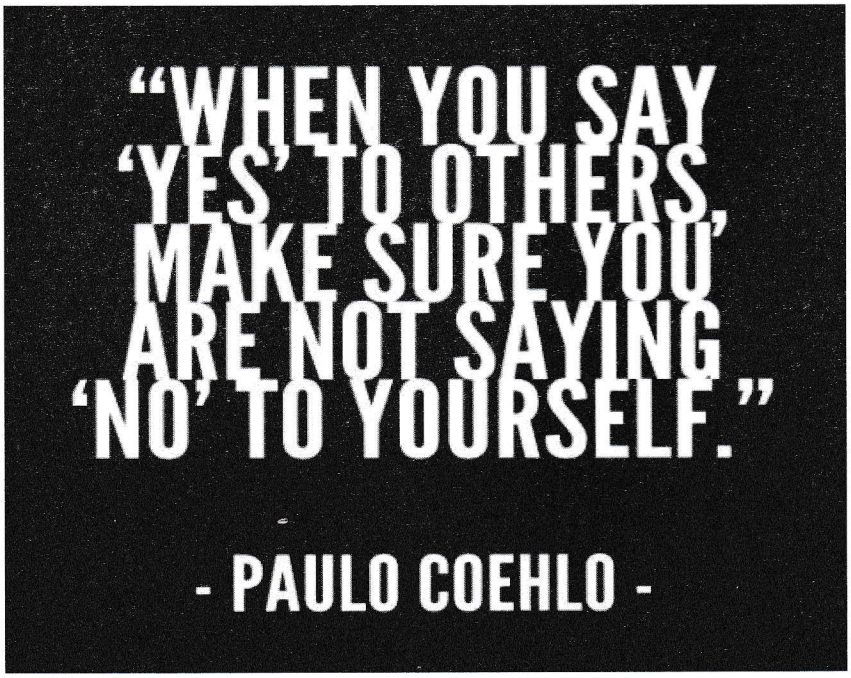

আমরা একটু ভিন্ন ধরনের শিশুকে তথাকথিত প্রতিবন্ধী বলে আখ্যায়িত করে থাকি। আসলে মানুষের মধ্যে যে অসীম সক্ষমতা বা সৃষ্টিশীলতা রয়েছে তার কতটুকুই বা আমরা জানি? কাউকে প্রতিবন্ধী না বলে 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি' বা 'বিশেষভাবে সক্ষম' শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার দাবি রাখে। এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা, সভ্যতা ও সৌজন্যবোধের উন্মেষ ঘটা দরকার।

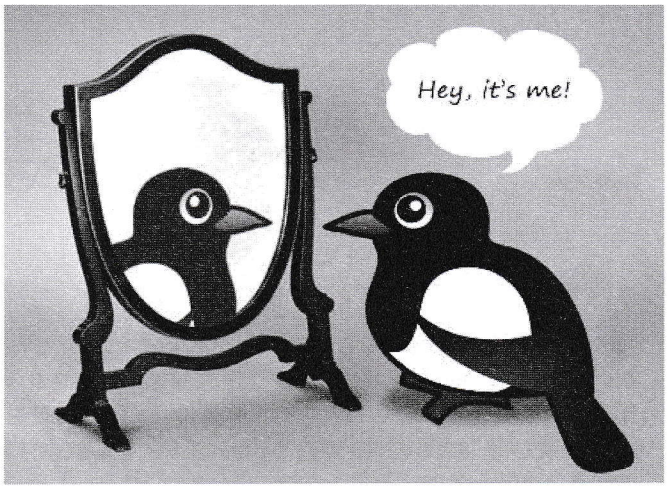

পিতা-মাতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, দাম্পত্য কলহ ও অশান্তি শিশুদের চাপের মধ্যে রাখে এবং দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে। সমাজে ব্যক্তির পারিবারিক অবস্থান কোথায় এবং কীভাবে পরিবারটি সমাজের সাথে সম্পৃক্ত সে বিষয়গুলিও ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধের সাথে জড়িত। তাছাড়া, পরিবারে ভালো জিনিসের চর্চা বা নৈতিকতাবোধ, শিষ্টতা, মানবিক মূল্যবোধ, সম্মান ইত্যাদির অভাব থাকলে তা পরবর্তীতে দুর্বল আত্মসম্মানবোধ গঠনে সহায়তা করে। তাছাড়া, পক্ষপাতমূলক চিন্তাধারাও নিম্ন আত্মসম্মানবোধ তৈরি করে। যেমন, ব্যক্তি নিজেকে কীভাবে দেখে আর ব্যক্তি অন্যের মধ্যে যা কিছু দেখে তা নিজের মধ্যে কীভাবে ব্যাখ্যা করে।

নিম্ন আত্মসম্মানবোধ দূর করার কয়েকটি উপায়

১) পক্ষপাতমূলক চিন্তাভাবনা থেকে যৌক্তিকভাবে বের হয়ে আসা।

২) উদারভাবে অন্যদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া (সুন্দর শব্দগুচ্ছ দ্বারা, অভিব্যক্তি দ্বারা ঈশারা-ইঙ্গিত দ্বারা), যা স্বীকৃতি দানকারী ব্যক্তি ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সম্মান ও উৎসাহ যোগাবে। এ ধরনের চর্চার ধারাবাহিকতা মানুষের আত্মসম্মানকে বাড়িয়ে দেয় ও ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে।

৩) কৃত্রিম ও মিথ্যা স্বীকৃতিসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা। যখন কোন মানুষ অন্যকে মেকি প্রশংসা করে, খোঁচা মারে কিংবা প্রতারণাপূর্ণ উৎসাহ দান করে, তখন সেগুলোকে কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, এগুলো অসৎ প্রচেষ্টা, যা সহসা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৪) শুধুমাত্র ইতিবাচক স্বীকৃতিগুলোকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা।

৫) কোন অসম্মানজনক স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন, যদি তা ভিত্তিহীন হয় তবে তাকে আমলে না নেওয়া। যেমন, কেউ যদি বলে, 'উনি খুব বাজে মানুষ। উনি কোন কাজের মানুষ নন,' তবে, এই বিবৃতির পরে, ব্যক্তি ভাবতে পারে, 'আমার সম্পর্কে কীভাবে সে এই কথা বলতে পারলো?' এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। শুধু এটাই বলা যায়, বক্তা অতি-সাধারণীকরণ করে ফেলেছেন।

৬) কাউকে প্রশংসা করা বা স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ঈর্ষা বা কার্পণ্য না করা এবং সব ধরনের প্রতারণা ত্যাগ করা। কারো সমালোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা আগে তার ভালো দিকগুলো বিবেচনা করবো এবং এমনভাবে তাকে দিক নির্দেশনা দেব যাতে তিনি ভুল থেকে উঠে আসতে পারেন।

শর্তহীন ও যথাযথ কারণবিহীন নেতিবাচক মূল্যায়নকে প্রত্যাখ্যান করা

কোন ব্যক্তি যখন নেতিবাচক অবস্থান থেকে কারো সার্বিক মূল্যায়ন করে তখন তার গায়ে এক ধরনের তকমা বা লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে, সব সময় ঐ মানুষটা ঐ লেবেলের মত নাও হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিজেকে জানা, নিজেকে সম্মান করতে পারা এবং দায়িত্বশীলভাবে নিজের ভুলগুলো শুধরে নেওয়া আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এভাবেই আমরা সত্যিকারভাবে অন্যদেরকে সম্মান করতে শিখব। সুতরাং, পরিবার, সমাজ ও শিক্ষায়তন আমাদের আত্মসম্মান তৈরি ও আত্মধারণাকে পরিষ্কার করার সূতিকাগার হিসাবে কাজ করে।

সক্রেটিসের ভাষায়, 'নিজেকে জান'।

নিজেকে সম্মান করতে পারা এবং দায়িত্বশীলভাবে নিজের ভুলগুলো শুধরে নেওয়া আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এভাবেই আমরা সত্যিকারভাবে অন্যদেরকে সম্মান করতে শিখব। সুতরাং, পরিবার, সমাজ ও শিক্ষায়তন আমাদের আত্মসম্মান তৈরি ও আত্মধারণাকে পরিষ্কার করার সূতিকাগার হিসাবে কাজ করে।

শুভাশীষ কুমার চ্যাটার্জী
মনোবিজ্ঞানী, ছাত্রকল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা